রাজারহাটে নগরায়ন - কিসের বিনিময়

শালতি রিসার্চ গ্রুপ

১৯৯৫ সালের ১লা জুন রাজ্য সরকার বিধাননগর উপনগরীর লাগোয়া রাজারহাট থাণার অন্তর্গত ২১টি মৌজায় ২৭৫০ হেক্টর জমিতে নতুন শহর বা উপনগরী তৈরীর কথা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। পিয়ারলেস, অম্বুজা, স্রাচী, আই- এফ- বি এবং ডি সি এল -এই পাঁচটি সংস্থার সঙ্গে রাজ্য সরকার উপনগরী তৈরীর চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

কলকাতা, সল্টলেক, দমদম বিমানবন্দর,ইস্টার্ন মেটোপলিটান বাইপাস ও ভি. আই. পি রোডের কাছাকাছি হওয়াতে এই নিউটাউনশিপের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। শহরের সমস্ত সুবিধা সহ এই খোলামেলা পরিবেশে জমি বা ফ্ল্যাট পাবার জন্য অসংখ্য আবেদন পত্র জমা পড়েছে। কিছু মানুষের সৌভাগ্য হয়েছে, তারা জমি বা ফ্লাট পেতে চলেছে। কিন্তু সেই কি হারিয়ে, কার বা কিসের বিনিময়ে?

প্রকল্প এলাকা

১৯৯৪ সালে এক সরকারি আদেশণামায়। উত্তর ২৪ - পরগণা, নং-২৭৮৭ এল- এ- (২)/ ৪ এইচ ১১ /৯৮ হাউসিং ঘোষিত হয় তারুলিয়া, গোপালপুর, সলুয়া, চন্ডিবেড়িয়া, হাতিয়াড়া,অটিঘরা, কৈখালী, তেঘরিয়া, নপাড়া, দশদ্রোণ, রাইগাছি, মহিষগোট, শুলুংগুড়ি, মহিষবাথান, রেকজোয়ানী, ঘুনী, বালিঙড়ি, থাক্‌দাড়ী, চকপাঁচুরিয়া, যাত্রাগাছিও কদমপুকূর - মোট এই ২১টি মৌজার জমি স্যাটেলাইট টাউনশিপ প্রকল্প নির্মাণের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে। এই ২১টি মৌজার মধ্যে ১৮টি মৌজায় জমি পাবার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

প্রকল্প খরচ

প্রকাশিত প্রজেক্ট রিপোটে বলা হয়েছে যে জমি অবিগ্রহণ করতে খরচ হবে ৪১২ কোটি টাকা, ২০৯৫ হেক্টের জলা ও জমি ভরাট করতে (৫ কম করে) লাগবে ২৪১ কোটি টাকা। রাস্তা ও সেতু নির্মাণ বাবদ ১৭৬৫০ কোটি, বিদ্যুৎ ৭৫ কোটি, টেলিফোন, গ্যাস, হাসপাতাল, শিক্ষা, পুলিশচৌকি বাবদ ১০০ কোটি, খেলার মাঠ, পার্ক, বিউটিফিকেশন বাবদ ১৫০ কোটি - মোট ১৪৯৭ কোটি টাকা। এছাড়া ৩৫০০ কোটি ঢাকা —ধার্য হয়েছে বহুতল বাড়ি জন্য। সর্ব মেটি খরচ ৫ হাজার কটি ঢাকা। এই খরচ দেবে রাজ্য সরকার, হাউসিং বোর্ড, টি আই, এল আই সি, পাবলিক বিজনেস হাউস, হাডকো সহআরো অনেকো।

প্রকল্প ঘোষণার আগে থেকই অস্বাভাবিক হারে জমি বেচা-কেনা

কিন্ত এর অনেক আগে থেকেই রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের রাজারহাটের জমির উপর নজর ছিল। ১৯৯৩ সালে আবাসন মন্ত্রীর নেতৃত্বে সি এম ডি-এর একজন অন্যতম ডক্টর সুনীল রায়, জনৈক গান্ধী ও মাযেশ্বরীরা হেলিকপ্টার চেপে এরিয়াল সার্ভে করেন রাজারহাটের ওপর। (সূত্র — নগরায়নের সরকারী পথ, রাজারহাট জিম বাচাঁও কমিটি) আনূষ্ঠানিক ঘোষণা হবার দু,বছর আগেই কোথায় শহর হবে, কোথা দিয়ে রাস্তা হবে, ব্যবসা বানিজ্যের কেন্দ্রস্থল কোথায় হবে তার ব্লু প্রিন্ট জমি হাঙরদের কাছে পৌছে যায়। তারা দাগ নম্বর অনূযায়ী জমির মালিক খুঁজতে মৌজায় মৌজায় জমির দালাল ছেড়ে দেয়। (সূত্র — নগরায়েনর সরকারী পথ, রাজারহাট জিম বএাচাও কমিটি)। ফলে যে জমির দাম ৫০০ টাকা

প্রতি কাঠা তা বিক্রী হতে লাগল ১০০০ টাকায়। কিন্তু রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীরা বিঘের পর বিঘে ফৃযি ও জলাজমি কিনে নিল -কেন ?

কেন এই কেনা-বেচা
১৯৯৬ সালের এক সরকারী নির্দেশে রাজারহাটের প্রস্তাবিত ২১টি মৌজায় জমি কেনা-বেচা বা রেজিষ্ট্রি বন্ধ হল। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে ১৯৯4 সালে উপনগরী তৈর্রীর নোটিফিকেশন প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই জমি কেণাবেচা বন্ধ করা হল না কেন? এই মধ্যবতী দু,বছরের সময়টী কার জন্য, কিসের জন্য?

রাজারহাট জমি বাঁচাও কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত নগরায়নের সরকারী পথ, পুস্তিকায় এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে-

... শহরের ব্লু প্রিন্ট অনুযায়ী জমির দাগ নম্বর মিলিয়ে জমির মালিক খুজতেই সরকার জমি হাঙরদের দু,বছর সময় দিয়েছিল কী ? দ্বিতীয় মত হল জমি বেচা-কেনা বা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি সুদুর প্রসারী চক্রান্ত। সরকার অনুমান। করেছিল যে কৃষকরা জমি বেচবে ণা। যাতে তারা জমি বেচতে বাধ্য হয় তার জন্য সুদূরে প্রসারী চক্রান্ত হলো জমি বেচা-কেণা বা রেজিস্ট্রী বন্ধ করে দেওয়া। গ্রামের চাষাভুষো মানুষদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বলতে জমি। বিপদে-আপদে সে জমি বন্ধক রেখে বা বিক্রি করে গ্রামের ফৃষক প্রয়োজন মেটায়, আবার ফসল ভাল হলে হারানো জমি উদ্ধার করে। অতএব জমি রেজিষ্ট্রি সুধী রেখে দিয়ে চাপ সৃষ্টি করতে পারলেই কৃষক বাধ্য হরে স্বেচ্ছায় যে কোণো মূল্যে জমি বিক্রি করতে-বাধ্য সরকারের কাছে। না হয় সরকারী অনুমোদিত কোম্পানীগুলির কাছে।

চাষীদের এই দুর্বল জায়গাটা কৃষক সমিতি ছাড়া আর কেউ ভাল করে জানে ণা। চক্রান্ত হল এইখানে। শুরু হল ভয় দেখানোর নতুন কায়দা সরকারি তরফে। আবাসন দপ্তর দংবাদপত্রগুলিতে বিজ্ঞাপন দিল ড়ৈনিম্নলিখিত মৌজার, নিম্নলিখিত দাগ নম্বরের জমি মালিকদের জমির দলিল-, পরচা সহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সাথে দেখা করার অনুরোধ জাণানো হচ্ছে। স্যাটেলাইট টাউনশিপের জন্যে এ জমি প্রয়োজন হতে পারে।

গ্রামের নিরক্ষর মানুষ সন্ত্রস্ত হল জমি চলে যাওয়ার ভয়ে। ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ জানে সরকার জমি নিলে তার দাম পাওয়া যাবে তা বলা কঠিন । তদুপরি সরকার যখন মনে করছে জমি তখন হাত ছাড়া হবেই। নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যরা, যারা শাসকদল বিরোধী, তারাও জানে য়ে বর্তমান জিম অধিগ্রহণ আইন ও নীতি অনুযায়ী সরাকার য়দি অধিগ্রহণ করেত চায় তাহলে দেশের সর্ব্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে পশ্চিম বঙ্গা সরকার জিম অধিগ্রহণ আইনের ১ ধারায় জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গা সকার জমি অধিগ্রহণ আইনের ঐ ধারায় বলা হয়েছে সরকারি কাজে ও জনস্বার্থে জমি অধিগ্রহণ করতে হলে জমির মালিককে জমির দাম আগ্রিম ও বর্তমান মূল্য অনুযায়ী দিতে হবে। তারপর সরকার জমি অধিগ্রহণ করতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গা সরকার জমি অধিগ্রহণ আইনের ১ ধারা অনুযায়ী জমির মালিকে অধিগ্রহণ নোটিশ না দিয়ে ভয় দেখিয়ে কিছূ জমি কিনতে পেরেছে তাদের কাছ থেকে। যারা টাকার প্রয়োজনে জমি বেচতে আগ্রহী।

দীর্ঘদিন অন্তভুক্ত থাকার পর কোন মানুষকে সামান্য ভাতের সাথে গরম ফ্যান ঢেলে দিলে যেমন অমৃত মনে করে খায়, তেমনি কিছু মানূষ নিতান্তই টাকার প্রয়োজনে জমি বিক্রির জন্য টাউনশিপ অফিসে গেলে লিখিয়ে নেওয়া হয় যে আমি স্বেচ্ছায় আমার জমি ৮০ হাজার টাকা কাঠা প্রতি বিক্র করিলাম। বাস্তবে কিন্তু সরকার তাকে কাঠা প্রতি মাত্র ৬ হাজার টাকার চেক দিচ্ছে। ট্রেজারি থেকে ব্যাঙ্কে চেক জমা করার পর জমির মালিক কম করে ৫ থেকে ৬ মাস অপেক্ষা করে বসে থাকছে। সরকারের তরফে আবাসন মন্ত্রী বারবার দৈনিক পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বলছেন আমরা জমি অধিগ্রহণ করিনি কৃষকরা স্বেচ্ছায় জমি বিক্রি করছে নতুন শহরের জন্য। অথচ স্বাধীন দেশের সংবিধানে মৌলিকঅধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে রাজার হাটের কৃষকরা।

এইভাবে ভূমিপুত্ররা উচ্ছেদ হল স্বভূমি থেকো

স্বেচ্ছা জমিদান প্রকল্প এখনো চলছে

তিনটি মৌজার জমি এখনো পাওয়া যায় নি। তাদের মধ্যে রায়গাছি মৌজায় রাস্তা থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যেকার জমির জন্য চাষীর প্রাপ্য দাম ২০,০০০ টাকা প্রতি কাঠা, পরবর্তী ৫০০ মিটারের মধ্যেকার জমির জন্য ১৪,০০০ এবং বাকী জমির জন্য ১২,০০০ টাকা প্রতি কাঠা। আর এক মৌজা গোপালপুরে এই দাম - যথাক্রমে ৩০,০০০, ২০,০০০ ও ১৪,০০০ টাকা প্লতি কাঠা। বাস্তবে এইসব জমির কাঠা প্রতি বাজার দর ১,৫০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ টাকা। (সূত্র - তকচির অহেমেদ, সভাপতি রাজারহাট জমি বাচাও কমিটি, ২১ শে সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখে কলকাতায় আয়জিত উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত জনশুনানীতে ওর বক্তব্য)

জমি ও জীবিকা হারিয়ে উন্নয়ন-উদ্বাস্তু

সরকারী ঘোষণা মত ৫ লক্ষ লোকের বাসস্থানের সংস্থান করতে গিয়ে ৪০টি গ্রামের ১,৩১,০০০ -এরও বেশী কৃষক মানূষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ৬১৭০ জন প্রান্তিক চাষী, ২১০৫ জন ছোট চাষী, ৪৬০৫ জন ভূমিহীন চাষী ও ৪০০০ জন মৎস্যজীবী বংশানুক্রমিক জীবিকাচ্যুত হবেন সূত্র - কেয়া দাশগুপ্ত, এডুক্শন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গাল - এ নোট, ২০০২)। যাদের জমি বা অধিগ্রহণ হল তারা দাম বা ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন বাজার দর থেকে অনেক কম। জীবিকা পুনর্বাসনের কোন পরিকল্পণা সরকারের নেই । আবাসন প্রকল্পে অল্প স্বল্প মালপত্র সাপ্লাই,-এর জন্য স্থানীয় যুবকদের নিয়ে কয়েকটা সমবায় তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে প্রকৃত পুনর্বাসন কিছুই হচ্ছে না। বহু মানুয চাযের জমি, বাস্তভিটে, জলাজমি ও জীবিকা খুইয়ে নগরায়ন ভিত্তিক উন্নয়ন-উদ্বাস্ত হতে চলেছে।

কিন্তু কিরকমছিল সেই জিমি — অনুর্বর ও অনুৎপাদক?

খড়গপুর আই আই টি-ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা প্রস্তাবিত শহরের প্রজেক্ট রিপোর্টে সরকার বলেছে যে রাজারহাটের ২১টি মৌজায় কোনো জলাজমি নেই, চাষ হয়না, মাছের ভেড়ি, ঘেরি, ঝিল, বিল নেই। তাহলে এরকম একটা জায়গায় উপনগরী হলে ক্ষতি কোথায়? কলকাতায় যে হারে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে সেটা খানিকটা কমতে পারে। উন্নয়ন,-ই তো হবে।

বাস্তব চিত্র কিন্তু সম্পর্ণ বিপরীত। এক এক করে সে কথা বলা যাক এবং সরকারী নথি ব্যবহার করেই প্রমাণ করা যাবে এক বিস্তীর্ণ/শস্য শ্যামলা ফৃযি জমি এবং প্রকৃতির এক অনন্য জলাভূমিকে এক আদূরদর্শী পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা কেমন ভাবে ধ্বংস করতে চলেছি।

ক. সেনসাস রিপোর্ট থেকে পাওয়া যাচ্ছে ২১টি মৌজার ২৭৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ২০৯৫ হেক্টর জমি চাষযোগ্য। গরমে দো-ফসলা ও এক ফসলা জমিতে প্রতি বিঘেয় ২৫ থেকে ২৭ মন ধান আর বর্ষায় ৮ থেকে ১২ মন ধান হয়। এছাড়া পাট, গম, সরযে, তিল, আখ ইত্যাদি চাষ হয়। বিরট অঞ্চলজুড়ে তরি-তরকারী চাষ হয়। প্রকৃতপক্ষে দমদম, সল্টলেকও প্রয়োজনীয় অনেকটা এই অঞ্চলথেকে যোগান আসে। কদমপুর,শিখরপুর,বাগু,বালিগাছি, গ্যারাগৈড়ি ইত্যাদি মৌজায় প্রচুর ফুল চাষের নার্সাধর আছো। এখান থেক ফুল রপ্তানি হয়। ২১টি মৌজায় ছোটবড়মিলিয়ে ১৫ লক্ষ গাছ আছে যারমধ্যে বাবলা,শিরিষ,আম,জাম,কাঁঠাল,পেয়ারা,লিচু,নারকেল, তাল, সুপারি ইত্যাদি ধানাচাষের ওপরে নির্ভরশীল প্রায় ১লক্ষ ৩১হাজর মানূষ,(৪০টি গ্রামের)। চাষীর সংখ্যা ১২হাজার- ৫০০,মাছচাষে যুক্ত ৪ হাজার জন। ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক সংখ্যা ৪৬৫০ জন। (সূত্র- নগরায়নের সরকরীপথ, রাজার হাটজমি বাঁচাও কমিটি)।

খ. রাজ্য সরকার আশির দশকে এইঅঞ্চলে সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প চালুকরেন। রিভার লিফটিং ইরিগেশন, গভীর ও অগভীর নলকূপ ও —স্পাউটের এর মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছ। বেসরকারী স্থানীয় যুবক রা ব্যাঙ্কলোন নিয়ে বাগজোলা বা কেষ্টপুর কাটা খালের জল চাষের জন্য বিক্রি করেছ. যদি জমি চাষ যৌগ্য নাহয় তাহলে এই সেচের ব্যবস্থা কেন?

গ. ২২° ৪০`উঃ থেকে ২২° ৩০`উঃ অক্ষরেখা এবং ৮৮° ২৫`পূর্ব থেকে ৮৮° ৩০`পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যবর্ত্তী সমগ্র অঞ্চলের প্রায় ৮০ ভাগ জলাভূমি। রাজারহাটের শহর হবে ২২° ৩৪`উঃ থেকে ২২° ৩৮`উঃ অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৮° ২৫`থেকে ৮৮° ৩০`পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধেধ্যে। ২৭৫০ হেক্টর প্রস্তাবিত উপনগরী এলাকার মধ্যে ৬৫৩ হেক্টর জলাভূমি, পঃ বঃ সরকারের পরিবেশ দফতরের ইনস্টিটিউট-অফওয়েটল্যন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইকোলজিক্যাল ডিজাইন -এর এর সংগ্রহ উপগ্রহচিত্র, পধিষেশ দফত-রে এবংসি এম ডি- এ-র নথিতেও এই জলাভূমির উল্লেখ আছে।

ঘ. জিওলজিক্যালে সার্ভে অফ হন্ডিয়া এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন -নদীর-তীরের স্বাভাবিক বাঁধ (Levee/ Crevasse), পরিত্যক্ত নদী গর্ভ, পয়েন্ট বার, কর্দমাক্ত জলাজমি (Back swamp / Tidal Mud Flat)ও লবণাক্ত জলাজমি (Salt March) ভূতাত্ত্বিক নামগুলি দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখানকার জমি জলাজমির সলে সম্পৃক্ত।

ঙ. রাজারহাটে ৪০০০-এর বেশী মৎস্যজীবী আছেন। এখানে জলাভূমিসহ অনেক মাছের ভেড়ি, ঘেরি,ঝিল,বিল ও পুকুর আছো।

এই জলাভূমি শহরের নিকাশী ব্যবস্থা।
রাজারহাটের জলাভূমি যে কতটা প্রয়োজনীয় তার উল্লেখ সরকারী চিঠিতেই রয়েছে- "...The wetland had consumed the waste of the city and at the same time had returned to the city a hygienic environmental condition. Fish vegetable and other essential commodities..." [সূত্র: Director of

Fisheries, Govt. of West Bengal –কে লেখা Dy. Director of Fisheries (M & P) এর চিঠি] । শুধুতাই নয় কলকাতার ফুসফুসের মত এই জলাভূমি বর্ষার অতিরিক্ত জল ধারণ করে কলকাতা শহর ও পার্শ্ববতী অঞ্চলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে। ঐ এখানকার ধুপীর বিলকে যথাযথ সংরক্ষণ করে আদর্শ ওয়াটার মিউজিয়াম- করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। ধুপীর বিল, ঘুনী, যাত্রাগাছি, বাগজোলা বিল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৪ ফুট উঁচু। এইসব প্রাকৃতিক বিলে সারা বছর জল থাকে এবং প্রাকৃতিক নিকাশি ব্যবস্থা সচল রাখে। কলকাতা, উত্তর চব্বিশ পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বর্ষার জল বাগজোলা খাল, নোয়াই খাল, লাবণ্যপ্রভা নদী, বেলেঘাটা খাল, ক্যান্টনমেন্ট খাল, হাড়োয়া খাল, আমডাসীর সুতী নদী, সবই কোন না কোন ভাবে কুলটি গাং হয়ে বিদ্যাধরী নদীতে পড়েছে। পরে খাল কেটে পিয়ালী নদীতেও ফেলা হয়েছে। এই যে খাল সহ পূর্ব কলকাতার বিশাল জলাভূমি নিয়ে যে নিকাশি ব্যবস্থা, সল্টলেক,ই এম বাইপাস, ভি অহি পি- রোডের ধারে অসংখ্য বেআইনী বাড়ী ও খাল বুজিয়ে রাস্তা করা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার প্রমাণ ১৯৯৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বরের বৃষ্টিতে কলকাতা ও উত্তর চব্বিশ পরগণার বহু অঞ্চলে জল জমে যাওয়া। ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটারী অথরিটি (C.M.W.&S.A.) সি এম ডি এ-র মতে রাজারহাটে শহর হলে তা আত্মহত্যার সমতুল্য হবে।

পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন

রাজ্য আবাসন দফতর রাজারহাটে নিউটাউনশিপ প্রকল্পের প্রজেক্ট রিপোর্ট সংক্রান্ত পুস্তিকায় (সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫) স্বীকার করেছে শহর নির্মাণের সিদ্ধান্ত হলেও EIA অর্থাৎ Environmental Impact Assessment তখনও পর্যন্ত করা হয়নি। রাজারহাট জমি বাঁচাও কমিটির পক্ষে হাইকোর্টে জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা করা হয় "...Only after filing of the petition Both the Departments (আবাসন ও পরিবেশ woke up and are looking into the matter..." [সূত্র — রিট পিটিশন নং ৭৫১৬ (ডব্লু), ১৯৯৯ —এর রায়] । আবাসন দফতর ইতিমধ্যে রাজ্য পরিবেশ দফতরকে দিয়ে ণা করিয়ে অন্য একটি সংস্থাকে দিয়ে ৩০৭৫ হেক্টর জমির Rapid Environmental Impact Assessments and Environment Management Plan (April, 1999) তৈরী - করায়। এই প্রকল্পের শুরু থেকেই পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির দিকটা পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা প্রকট হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত পরিবেশ দফতর ৬২২ হেক্টর জমিতে পরিবেশ ছাড়পত্র দেয়।

টুকরো আশা না গভীর সুদূর হতাশার পথে

কোন প্রতিবাদ বা আন্দোলন সল্টলেক গড়ে ওঠাকে থামাতে পারে নি। বিশাল জলাভূমি হারিয়ে গেছে। রাজারহাটের মানুষের দিনের পর দিন লড়ায়ে খানিকটা পিছু হাটে সরকার। আপাতত ৬২২ হেক্টর জমিতে আবাসন প্রকল্প সীমিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন। বাকী অংশে ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প হবে না এমন কথাও সরকার ঘোষণা করে নি। বরং বিপরীত সম্ভাবনাই বেশী। তাহলে কৃষককে জমি বেচতে বাধ্য না করে, তাকে সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে, তার জীবন ও জীবিকা বিপন্ন করে, দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা কৌমজীবনকে নষ্ট করে, সমগ্র পরিবেশের ক্ষতি করে আমরা কি নগরায়নের এই পথেই হাঁটব?